ত্যাগরাজ

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে সোমবার মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার তিরুভারুর নগরে মুলকনাড়ু বা মুরিগিনাড়ু সম্প্রদায়ভুক্ত ভরদ্বাজ গোত্রের তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতগুণী ত্যাগরাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ত্যাগরাজের পিতামহ গিরিরাজ ব্রহ্মম্ ছিলেন কবি ও গীতিকার। ১৬৮৪-১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাহজী মহারাজার রাজত্বকালে গিরিরাজজী ছিলেন রাজসভার বিদ্বান। তিনি যক্ষগান ও বৈদান্তিক বিষয়ের সংগীত রচনা করেছিলেন। ত্যাগরাজের পিতা ছিলেন রামব্রহ্মম্ ও মাতা ছিলেন সীতাম্-মা। রামব্রহ্মম্ ছিলেন বিদ্বান ও একনিষ্ঠ দেবভক্ত। তাঁর ৩ পুত্রের মধ্যে ত্যাগরাজ ছিলেন কনিষ্ঠ। অন্য ২ পুত্র হলেন পঞ্চপাকেশন ও রামনাথন।

তাঞ্জোরের মহারাজ দ্বিতীয় তুলজাজি (রাজত্বকাল ১৭৬৫-১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) -র দরবারে রামনবমীর উৎসবের দিন রামব্রহ্মম্ রামায়ণ ব্যাখ্যা করতেন।

বাল্যকাল থেকেই ত্যাগরাজ পিতার ব্যাখ্যা করার সঙ্গে রামায়ণ শ্লোক পাঠ করতেন। এইভাবে অতি অল্প বয়সেই তিনি ভারতীয় মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৮ বৎসর বয়সে ত্যাগরাজের উপনয়ন হয়েছিল। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে পরবর্তী শিক্ষা পেয়েছিলেন তিরুভাইয়ারের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে প্রায়ই তিনি সেন্টি বেঙ্কট রামানাইয়ার বীণা শুনতে চলে যেতেন। বেঙ্কটজীর বীণা শুনে তাঁর সংগীতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও দেখা যায়। সংগীতের প্রতি পুত্রের আকর্ষণ দেখে রামব্রহ্মম্ পুত্রকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্য বেঙ্কটজীকে অনুরোধ করেছিলেন। বেঙ্কটজী এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ত্যাগরাজকে সংগীত শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। ত্যাগরাজের প্রতিভা বুঝতে পেরে বেঙ্কটজী মাত্র ১ বৎসরের মধ্যে তাঁকে সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। ফলস্বরূপ ত্যাগরাজ সংগীতের গভীরে প্রবেশ করে এক সিদ্ধ বিভূতি রূপে শ্রী রামকৃষ্ণানন্দকে দর্শন করেছিলেন। এঁকেই ত্যাগরাজ নিজের রচনায় নারদের অবতার বলে মনে করেছেন।

ত্যাগরাজ ছিলেন একাধারে গায়ক, গীতিকার ও সংগীত শাস্ত্রকার। সংগীত শাস্ত্রেজ্ঞান থাকায় তিনি বহু রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া, যেসব রাগের স্বর রূপ অস্পষ্ট ছিল সেইগুলিতে তিনি স্পষ্ট রূপের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় কৈশোর কাল থেকেই তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে তিনি কবিতা রচনা করে বাড়ীর দেওয়ালে লিখে রাখতেন। সংগীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে নিজের সৃষ্ট বহু রাগে তিনি গীত রচনা করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১০০ টি গীত রচনা করেছেন। এইসব পদ নিয়ে 'ত্যাগরাজ হৃদয়' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনায় তিনি আধ্যাত্মিক মাহাত্মকে প্রকাশ করেছেন।

বেঙ্কটমুখী রচিত 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' গ্রন্থটির সাহায্যে ত্যাগরাজ ৭২টি মেল রাগেই গান রচনা করেছিলেন। এর ফলে বহু নতুন ও অপ্রচলিত রাগ যেমন, জনরঞ্জনী, ফলরঞ্জনী, বিজয়শ্রী, কোকিলাধ্বণী প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি শুধুমাত্র তোড়ী রাগেই ৩০টি গীত রচনা করেছিলেন। নাট, গৌল, শৃঙ্গার, আরাভি, বরালি রাগে তিনি 'পঞ্চরত্নম' রচনা করেছেন। দিব্যনাম কীর্তনম্ এবং

উৎসব সম্প্রদায় কীর্তনম-এর দ্বারা তিনি দক্ষিণভারতীয় ভক্তিগীতির শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি ১০০টি কীর্তনের পদ নিয়ে 'কীর্তন শতক' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'শতরাগ রত্নমালিকা' রচনা করেছিলেন। তাঁর ২৪,০০০ কৃতি রচনা যথেষ্ট পান্ডিত্যপূর্ণ অবদান।

তাঁর ভজন পরিবেশনের রীতি ছিল পৃথক। দিব্যনাম কীর্তনম ও উৎসব সম্প্রদায়ের কীর্তন গানে ২টি পর্যায় ছিল। উত্তরভাগ ও পূর্বভাগ। পূর্বভাগ শুরু করা হতো নামাবলী দিয়ে। কিন্তু ত্যাগরাজ শুরু করতেন স্বরচিত কৃতি দিয়ে।

ত্যাগরাজকে দক্ষিণ ভারতীয় আধুনিক গীতিনাট্যের জনক বলা হয়। সেখানে বিভিন্ন মন্দিরে নৃত্যনাট্যের প্রচলন থাকলেও তিনি গীতিনাট্যই রচনা করেছিলেন। তিনি তেলেগু ভাষায় 'প্রহ্লাদভক্তি বিজয়ম্', 'নৌকা চরিতম্' ও 'সীতারাম বিজয়ম্' নামক ৩টি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। মধ্যজীবনে তিনি প্রথমশ্রেণীর গীতিকার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহুদূর থেকে সংগীতগুণীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসতেন।

ত্যাগরাজ যে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের গায়ক ও গীতিকার ছিলেন তা নয়, তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীণাবাদকও ছিলেন। শোনা যায় যে, চেন্নাইয়ে অবস্থানকালে তিনি 'দেবগান্ধারী' রাগটি ৬ দিন ধরে ৬ প্রকার বিস্তার সহ পরিবেশন করে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রসংশা পেয়েছিলেন। তার বহু শিষ্যদের মধ্যে সুব্বারায় শাস্ত্রী, বেঙ্কট-রমন, কৃষ্ণস্বামী ভগবতার, বীণা কুপ্পায়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেছিলেন। সীতালক্ষ্মী তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন। ত্যাগরাজের জীবন ছিল সহজ ও সরল। দরিদ্র হয়েও লোক সেবায় তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল।

সম্পত্তি বলতে ছিল পিতৃভিটের এক অংশ এবং সামান্য কিছু জমি। তথাপি তিনি লোকসেবা থেকে কখনও বিরত থাকেননি। তাঁর শিষ্য, গায়ক এবং পন্ডিতের সমাবেশে তাঁর গৃহ সুন্দর পরিবেশে ভরা থাকতো। শিষ্য ও অতিথিদের জন্য তিনি উঞ্ছভিক্ষাবৃত্তিও (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মানসিকতার মানুষরা যে ভিক্ষা করতেন) গ্রহণ করেছিলেন।

শোনা যায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান প্রার্থণা করেছিলেন। এবং সংসার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা

শুনে তাঁকে সন্ন্যাস নেবার জন্য স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। এরপরই তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী পৌষ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ত্যাগরাজের তিরোধান ঘটে। কাবেরী নদীর তীরে আজও ত্যাগরাজের সমাধি বর্তমান। ত্যাগরাজের বিপুল কর্মকান্ডের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় বহু সংগীতানুরাগীগণ জ্ঞান ও যশ অর্জন করেছিলেন।